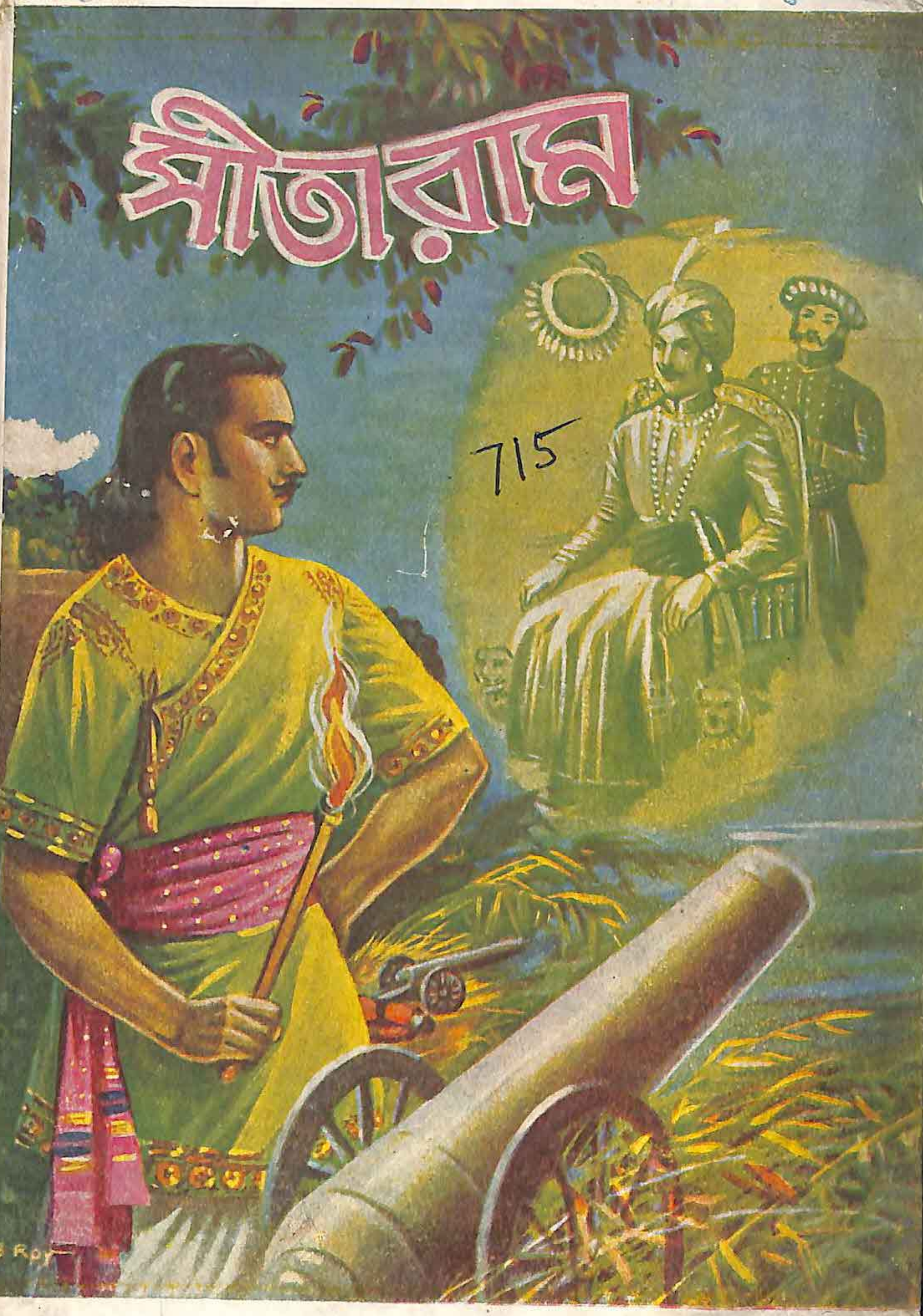

সীতারাম
B Roy



পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য নির্দ্ধারিত

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র নবম গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

সেপ্টেম্বর
১৯৮৫
১৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

সম্পাদকের ভূমিকা

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, এই-সব উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার মূল্য আজ আর ততখানি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই উপন্যাস লেখেন, তখন বাংলার ইতিহাসের মালমশলা তাঁর কাছে বিশেষভাবেই কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ইতিহাসের দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এইজাতীয় উপন্যাসের সৃষ্টি করে-ছিলেন। বাংলার শিক্ষিত লোকেরা যাতে নিজের দেশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে গবেষণা করেন, তার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বারবার ক'রে বিভিন্ন রচনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। বাংলার অতীত ইতিহাসের গৌরব সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন ক'রে তোলবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে এই কাহিনী রচনা করেন। বাঙালীর মধ্যে স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করবার জন্যেই এই জাতীয় উপন্যাসের সৃষ্টি হয় এবং বাংলার জাতীয় আন্দোলনে তা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ইতি—

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়,—মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন, নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কালেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই

সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত করিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন,······বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয় জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাঁহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

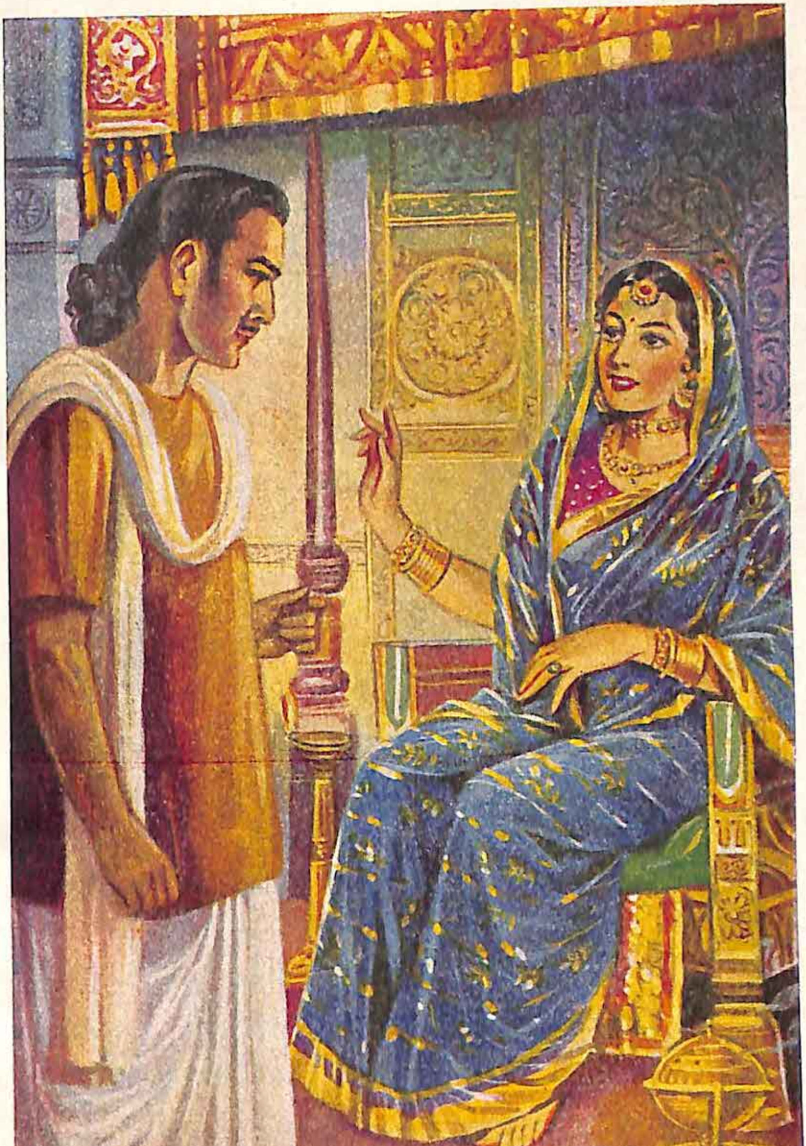
অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

———



..."যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও।"

সীতারাম

প্রথম খণ্ড

দিবা—গৃহিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম 'ভূষণো'। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীর-বাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং 'ভূষণা' স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় একশত আশী বৎসর পূর্ব্বে, একদিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর একজন মুসলমান ফকির শুইয়া ছিলেন। ফকির আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন, এমন সময় সেখানে একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকির পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম, গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সেকালে মুসলমান-ফকিরের বড় মান্য ছিল। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিল না। বলিল, "সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না, কোন উত্তরও করিলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিল; বলিল, "আল্লা আপনার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্। আমায় একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িলেন না, কথাও কহিলেন না। অগত্যা গঙ্গারাম তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিলেন —তিনি কাজীর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই-চারিবার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম মার সৎকারের জন্য পাড়া-প্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেল। পাঁচজন স্বজাতি জুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্নে শ্রী নাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে দুইজন পাইক, ঢাল-সড়কি বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষণ্ণ হইল। সভয়ে দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর?—আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "কাফের! চল্।"

পাইকেরা বলিল, "চল্।"

একজন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর-একজন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। একজন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর-একজন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে

উর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথায় পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজীর কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফার্‌সি ও আর্‌বি শব্দসকল-সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজী সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী শাহ সাহেব—সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ সাহেব। কাজী মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরান ও নিজের চশমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্ সমালোচনা করিয়া পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল।

যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার, তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। 'তোবা তোবা' বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই-চারিটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজী সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দিল এবং তাহাকে গালি দিতে দিতে, ঘুসী, কিল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইয়াছিল, সেদিন আর কিছু হয় —নাপরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ-সংবাদ পৌছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীয়ন্তে কবর হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গারামের অনুজা।

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে-মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও!"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি-চুপি কি বলিল। পরে দুইজনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি-ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। অবশেষে দুইজনে একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

পাঁচকড়ির মা সেই গৃহের ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিল, "এই একটি দুঃখী অনাথা মেয়ে এয়েছে, একে তোমার মুনিবের কাছে লইয়া যাইতে হইবে।"

শ্রী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া একপাশে

দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চল মা!"

ভাণ্ডারী শ্রীকে পেঁছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কে?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া, আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্য-সুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী?"

শ্রী বলিল, "আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্যা নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, "এতদিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ ত অত কাঁদিতেছ কেন?"

শ্রী তবু কাঁদে—কথা কহে না। সীতারাম বলিলেন, "নিকটে এসো।"

তখন শ্রী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না—আমার অশৌচ—আজ আমার মা মরিয়াছেন। সেজন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আজ আমার ভারী বিপদ্।"

সীতা। আর কি বিপদ্।

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজী সাহেব তাহার জীয়ন্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন কারাগারে আছে।

সীতা। সে কি? কি করেছে?

তখন শ্রী যাহা-যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা-যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায়?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি; তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতা। আমি কি করিব ?

শ্রী। তুমি কি করিবে ? তবে কে করিবে ? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজী। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য ?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায় নাই ?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে, তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি, কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। তুমি দীনদুঃখীকে বাঁচাইলে কখনও তোমার অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে ?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে ? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম—গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকগোছ মানুষ, তসর-নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে—কেবল এক 'রেফ'।

কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,—খুব লম্বা ফোঁটা,—আর-আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন।

আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই-একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি

যে, টোলে ব্যাকরণ-সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতী-পারে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক খুব বড় ফরদা জায়গায়, সহরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে দলে দলে পালে পালে লোক আসিতে লাগিল। মাঠ প্রায় পুরিয়া গিয়াছে। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনুমানের মতন আসীন; কোথাও বাদুড়ের মতন ঝুল্যমান; মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ করিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্র-মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা প্রায় জনশূন্য। দুই চারি জন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে,

তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড়-বড় যোয়ান ও হাতে বড়-বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া, কেবল একজন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ্বমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখমুখ ফুলিয়াছে, বেশভূষা বড় আলুথালু—যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না।

যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না!"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই স্ত্রীলোক শ্রী, বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার।

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, কতকগুলো লাল পাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। বোধ হয় ফৌজদারি সিপাহী।

বাস্তবিক দুইশত ফৌজদারি সিপাহী সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি হইতেছে?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া, শ্রেণী বাঁধিয়া প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকির।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার? শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। শ্রী সেই ডালের উপরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময় চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এদিকে দেখ! এদিকে দেখ! ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?"

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে

আসিতেছে। যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র। শ্রী চিনিল, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এদিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল।

সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণত-মস্তকে শাহ-সাহেবকে বিনয়পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজি সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এখানে কি মনে করিয়া ?"

সীতা। এই গঙ্গারাম—অভদ্র হোক্ আর যাই হোক্, আমার স্বজাতি।—তাই দুঃখে পড়িয়া হুজুরে হাজির হইয়াছি, জান্ বখশিস্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি। সে কি ?—তাও কি হয় ?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারেন।

কাজি। খোদা মালেক, আমা হইতে এ-বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরিমানা দিব। জান্ বখশিস্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি সাহেব ফকিরের মুখপানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িলেন। কাজি বলিলেন, "সে-সব কিছু হইবে না, কবরমে কাফেরকো ডারো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি যোড়হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির !

কাজি ফকিরের মুখপানে চাহিলেন, ফকির নিষেধ করিলেন, সে-কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিলেন। তাও না। পাঁচ হাজার—তাও না। আট হাজার—দশ হাজার, তাও না। সীতারামের আর নাই। শেষ সীতারাম জানু পাতিয়া করযোড় করিয়া, অতি কাতরস্বরে বলিলেন, —"আমার আর নাই। তবে আর অন্য যা-কিছু আছে, তাও

দিতেছি। আমার তালুক-মুলুক, জমিজেওরাত, বিষয়-আশয় সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।”

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ ?”

সীতা। ও আমার যেই হউক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম।

কাজি। এ ব্যক্তি মুসলমান-ফকিরের অপমান করিয়াছে। উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া, কাজি সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“কাফেরের প্রাণ ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না ? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটি চাপা দিন। আমি হরিনাম করিতে-করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণ দান করুন। দোহাই আপনার কাজি সাহেব! আপনার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর! ধর্ম্মাচরণ করুন! আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান করুন।”

কাজি সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ-সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি-চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, ‘এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারী তহবিলে কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া এই হতভাগাকে ছাড়িয়া দিলে হয় না ?”

শাহ-সাহেব বলিলেন, “আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন ?”

কাজি। আমি তাহা পারিব না, সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই। বিশেষ, এ-ব্যক্তি মান্যগণ্য ও সচ্চরিত্র, তা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার আর নিস্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ-সাহেবের সঙ্গে কাজি সাহেবের

নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া, সে যোড়হাত করিয়া কাজি সাহেবকে বলিল, "এ গরিবের প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমার প্রাণদান দিবেন, আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা, স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। একজন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাক্‌ড়ো ওস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাকৃড়ানো বড় শক্ত কথা। সে কাজ হইল না।

এদিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজি সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজি সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামারের সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারী বেড়ি, হাতকড়ি, সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকির বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি? সরকারী-বেড়ি লোকসান হইবে কেন? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আর, বদ্‌মায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজি সাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক-ওদিক

দেখিল। তারপর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন। ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল। সিপাহীরা "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল কিন্তু তাহারা পথ পাইল না।

লোকারণ্য হইতে কোনমতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল ; দেখিবে কি হইতেছে। দেখিল, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢালসড়কীওয়ালা। হিন্দুরা বাছাবাছা যোয়ান আর সংখ্যায় বেশী। মুসলমানেরা তাহাদের কাছে হটিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা 'মার্ মার' শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিল, যাহারা এই 'মার্ মার্' শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে-মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্ মার্!" গঙ্গারাম ভাবিল, "এ কি এ?" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিল, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লব-রাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে-ঘুরাইতে ডাকিতেছেন—"মার্! মার্! শত্রু মার্!" যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"

গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছিল যে, যথার্থ ই চণ্ডী অবতীর্ণা—তারপর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিল, শ্রী!

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার

করিতে-করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমান-শূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিল, একজন ভারী লম্বা যোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিল, পশ্চাৎ আর-একজন সড়কীওয়ালা শাহ-সাহেবের কাটা মুণ্ড সড়কীতে বিঁধিয়া, উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া সসৈন্যে ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। এই শুনিয়া অল্পকাল মধ্যে সেই লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনই জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, "তুমি যে আমার ঘোড়া লইয়া পলাইয়াছিলে, তাহার উপর আর-একবার চড়িয়া পলায়ন কর।"

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া ?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না। তুমি বড় নদী পার হইয়া শ্যামপুরে যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ; নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের ভ্রূকুটি দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল ; এবং সীতারাম কিছু ধমক-চমক করায় ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শ্রী এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল, তারপর এদিকে-ওদিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায় ?

সীতা। কেন, আমার মার বাড়ী ?

শ্রী। সেখানে কে আছে ?—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর ?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে ? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসী দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেইখানে যাইবে। সেখানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন, বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এতদিন পরে, এ-কথা কেন?'

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনা অপরাধে বিবাহের কয়দিন পর হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। সে-পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে-কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না?

শ্রী। এমন কি কথা? তবে না শুনিয়া আগে স্বীকার করি কি প্রকারে?

সীতা। দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। এইবেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয়, তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে, উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন ; শ্রী বসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

"তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন, মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতাঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল ; সেইদিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট-রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়, অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন ; বলিলেন, "আমার কথা বাকি আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ-কথা জানাইতাম, কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল ; বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ-কথা লুকানো আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তারপর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রী ভাসিয়া গেল, তারপর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

এতদিন পরে সেদিন রাত্রিতে সীতারাম যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন, কিন্তু এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া যেদিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেইদিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেইদিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্যদিকে প্রতিধ্বনিত হয়—আবার সীতারাম সেইদিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথাও নাই। রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই যাকে ডাকি তাকে ত পাই না! যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয়ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা-প্রভাতকালে শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী সীতারামের হৃদয়ে তরঙ্গে-তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিলেন, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারে?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারামকে তিনি শ্যামপুরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়?"

গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি।"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে এখানে আসে নাই?

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এইখানেই আছি, তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সেজন্য টাকাকড়ি যাহা আবশ্যক হয় আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা যে, সীতারামের কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। ফকিরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে, সীতারাম ভীত হইয়া কিছুকালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সেদিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর-দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাতক

যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর- সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগর-নির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। প্রজাগণ হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগর নির্ম্মাণ ও রাজ্যরক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা এবং প্রজাবর্গের হিন্দু-রাজ্যস্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না ; কেননা, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। যখন তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই, বরং দিল্লীশ্বরকেই সম্রাট্ স্বীকার করিয়া জমিদারির খাজনা পূর্ব্বমত রাজকোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব-প্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন, আর নূতন নগরীর নাম "মহম্মদপুর" রাখিয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার কোন কারণই রহিল না।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। তোরাব খাঁ সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সীতারামও আত্মরক্ষার্থ মহম্মদপুরের চারিপার্শ্বে দুর্ল্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন এবং সুন্দরবনপথে গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিনজন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃন্ময়, তৃতীয়

গঙ্গারাম। এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে একজন মুসলমান-ফকিরের সঙ্গে সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাহারই পরামর্শমতে নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন, "মহম্মদপুর"।

দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের যেমন তিনজন সহায় ছিল, তেমনি তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে একজন পরম শত্রু ছিল। শত্রু তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী, রমা। রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া, যুঁইফুলের মত বড় কোমল-প্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্জেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও শৌর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তাহার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন দেখিল যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রি-দিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল, তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। সে ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত, "হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি।"

রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই ত' বৈতরণী। পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়? আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?" খর-প্রবাহিনী বৈতরণী-সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল।

"এ সে বৈতরণী নহে। 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী' —আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও,—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

শ্রী বলিল, "ওমা! সেই সন্ন্যাসিনী। তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ-পারে, না ও-পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পেঁ ছিতে হয়। কেন মা, এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ-পারেই কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ওপারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এপারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না—

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হলে বাতাস উঠিবে!

সন্ন্যাসিনী। তুফানের ভয় কর মা! কেন, তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না, আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই নাকি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না, দুইজনে একত্রে যাই।

শ্রীর মন টলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মা? তুমি দিনপাত কর কিসে?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না।

সন্ন্যাসিনী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না—আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা তোমার এই বয়স—এই রূপের রাশি—

সন্ন্যাসিনী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে? তুমিই বা লোকের কাছে কি পরিচয় দিবে?

সন্ন্যাসিনী। তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখিলেই কি সাজ হইবে?

সন্ন্যাসিনী। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, সব আমার এই ঝুলিতে আছে। সব দিব।

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী-সন্ন্যাসিনী, শ্রীকে আর এক রূপসী-সন্ন্যাসিনী সাজাইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতা জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতিরুদ্রাক্ষাদি শোভিতা হইয়া পুনরপি শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। চলিতে-চলিতে সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কখনও ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি ?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান ?

সন্ন্যা। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে ?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ-বিদ্যায় অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি ?

সন্ন্যা। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায় ?

সন্ন্যাসিনী। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর সেখানে পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুইজনে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। কোন জ্যোতির্বিদ তাহাদের দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।



...কাজী সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে, নিম্নে সহস্র-সহস্র তাল-বৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎ ক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়। সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। তাহার ভিতর পরমযোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, দেখিল, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া তাহারা সে-রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিল।

প্রত্যূষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্ত্রী কে?"

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে; উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল।

স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বামহস্তের রেখাসকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। তোমার অদৃষ্টে রাজ্য-ভোগ নাই।

শ্রী স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন ?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশ গত।

শ্রী। তাহাতে কি হয় ?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে ?

স্বামী। এখন বলিতে পারিতেছি না। আগামী বৎসরে তুমি আমার নিকটে আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই যুগল সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি ?"

স্নেহ সম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুইদিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই দুইদিন—মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল, কেননা, সন্ন্যাসিনী

শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া, বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "আর, মা-বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমাদের দুর্জনেরই প্রায় সমান বয়স, আমরা দুইজনে ভগিনী। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব ?"

শ্রী। আমার নাম, শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব ?

সন্ন্যা। আমার নাম, জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও ; এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে ? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে, কখনও কি ভাবিয়াছ ?

শ্রী। না, ভাবি নাই। কিন্তু এতদিন ত কাটিয়া গেল।

সন্ন্যা। কিরূপে কাটিল ?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধ্যা—জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমাগত শ্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে, নগরে-নগরে, তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গা-রামকেও কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সীতারাম এইরূপ বহু সন্ধান করিয়াও শ্রীর কোন অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ-পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেননা, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

এদিকে মুরশিদ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল সীতারামের জমিদারীতে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

তোরাব খাঁ বড় গোপনে-গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন। চন্দ্রচূড়ের

গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা-বাছা সিপাহী সংগ্রহ হইতেছে, ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন।

ইহার সকল উদ্যোগ করিয়া সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃন্ময়কে, নগর রক্ষার ভার গঙ্গারামকে এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না, সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কান্নাকাটি একটু থামিলে রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ-সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ-সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয়ত তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয়ত ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা, যা করে করুক, রমার তাতে ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন তা একরকম ভালই হইয়াছে। সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে।

রমা আগে সীতারামের কথা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

তারপর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তারপর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে?"

ভাবিতে-ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল। মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন? রমা এ-কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? রমা ভাবিতে-চিন্তিতে পারিল না। যেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে তোরাব খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময় মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে-সংবাদও মহম্মদপুরে পৌঁছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম দাস, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিল। বলিল, "এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহর ত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে ততই ভাল। তাহলে দুই মাস, ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকেও যাইতে দিবে না। যে যাইবে, তাহাকে গুলী করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্রশস্ত্র

একখানিও সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর, খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।”

সেনাপতি মৃন্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড়ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, “এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়ে তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?”

চন্দ্রচূড় বলিলেন, “এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এপারে কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এপারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।”

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্ পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে, তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটি কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে ‘আসিতেছে’ অর্থে বুঝিল, ‘আসিবার উদ্যোগ করিতেছে’; ভিতর-মহলে ‘আসিতেছে’ অর্থে বুঝিল, ‘প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে’। তখন অন্তঃপুরমধ্যে কাঁদা-কাটার ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ, রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত থাকিতে হইল। নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এদিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—“মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও।”

নন্দা তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা। পুরুষ মানুষেরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম—নগররক্ষক। এ-সময়ে রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণে সে বিশেষ মনোযোগী। যে-দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে সে নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায় গঙ্গারাম যখন গৃহাভিমুখী হইতেছিল, এমন সময় কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "আমি যে হই, তাতে আপনার কোন প্রয়োজন নাই, আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেইখানে এখনই যাইতে পারিবেন?"

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম, মুরলা। ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি

এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। কিছুদূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিল, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া বলিল, "এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে নাকি?"

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না। এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। প্রহরী গঙ্গারামকে দেখিয়া বলিল, "এ কোন্?"

মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

প্রহরী আর কিছু বলিল না।

মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতলায় উঠিল। সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিল। মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ, রজত-পালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—উজ্জ্বল দীপাবলীর স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিল, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এজন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠা মহিষী —রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। দাদা মহাশয়! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল, "কি হইয়াছে? কি করিতে হইবে?"

রমা। কি হইয়াছে? কেন, তুমি কি জান না যে, মুসলমান মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে--আমাদের সব খুন করিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে?

গঙ্গা। মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা কি জন্য? আমরা তবে আপনার অন্ন খাই কেন?

রমা। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড়-রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাদের সঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। বড়

রাণী সে-কথায় বড় কান দিলেন না—তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনা-পাতি আছে সব নাও। আর আমার টাকা-কড়ি যা আছে, সব নাহয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানদের কাছে যাও। বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য নগর সব ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না; কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণি! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন, বল্লেন—আর কখনও কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ-কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার ছেলের দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল, "চুপ করুন! আপনার ছেলের উপায় আমি করিব।"

রমা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান করিলে। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন", এই বলিয়া রমা গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা তাহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

এদিকে চন্দ্রচূড়ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে এই কথা বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, "আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা, শেলেখানা, আপনা-দিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি?—টাকা দিয়া নিন্ না?"

চন্দ্রচূড় মৃন্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ-কথা জানাইলেন। মৃন্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "কি! এত-বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর

করিতে-করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। ততদিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর, কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল।

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

গঙ্গা। খবর ভাল। রাজ্য-রক্ষা হইবে।

মুরলা। তবে আমি এই কথা মহারাণীকে বলি গে ?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান ?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া রাজ্ঞীসমীপে সংবাদ নিবেদন করিল।

এদিকে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্পস্বল্প টাকা দিলে মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন, "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও ?"

চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন ; তোরাব খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তারপর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে, সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে ?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গা-রামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না।

ভয় দেখাইয়া গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম আজি কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ-কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশবার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছু দোষ হইত না, কেন না, রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র।

কিন্তু গঙ্গারামের মনের সে-অবস্থা নহে। গঙ্গারাম পাপিষ্ঠ। গঙ্গারাম ভাবিল, "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন। তাই দুইজনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফামধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী ততক্ষণ বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তোমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।"

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে। এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক কি যাহারই হউক, যখন শুভসাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

যতক্ষণ এই কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল।

শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন?"

মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।"

তখন দুইজনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং উভয়ে বিরূপা-তীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল।

———

নবম পরিচ্ছেদ

বন্দেআলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান গঙ্গারামের অনুগ্রহে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হইয়াছিল।

গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিত। সে এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট পাঠাইল। বলিয়া পাঠাইল, "চন্দ্রচূড়ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন—টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনা বাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আসামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দেআলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব খাঁর একজন বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দেআলির পক্ষে কঠিন হইল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইল। তোরাব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন ঃ

"তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে বাহির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণা হইতে ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ-শাহ ফকির—সেও পার হইতেছিল। ফকির বন্দে-আলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিলে ?"—জিজ্ঞাসা করায় বন্দেআলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বখ্‌শী, মুনসী, কারকুন, পেস্কার লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে-মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিল। ফৌজদার তাহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইলেন না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মৃন্ময়ের তাঁবে অনেক সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর-পথ, এক দক্ষিণ-পথ। দক্ষিণ-পথে দূরে নদী পার হইতে হয়। উত্তর-পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ-পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মৃন্ময় তাহা বিশ্বাস করিবে, কেন না, কিল্লার সম্মুখে নদী পার হওয়া কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সে-ও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ-পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর-পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না, বা, অল্পই



"এই ত' বৈতরণী। পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়?
আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে কি?"

থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা-পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃন্ময় দক্ষিণ-পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর-পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ-পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর-পথে পাঠাইবেন। উত্তর-পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন তাহা কেহ না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তারপর মৃন্ময় ফৌজ লইয়া কিছুদূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মৃন্ময়ের সৈন্যও উত্তর-দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, "উত্তম। তুমি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?"

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিল—বলা বাহুল্য, সে পুরস্কার রমা।

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল, এবং সেই রাত্রিতেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদ-শাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী-সৈন্য দক্ষিণ-পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃন্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে এই স্থির হইল যে, মৃন্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবন সেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে রণসজ্জার ধূম পড়িয়া গেল। মৃন্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিলেন। গড়রক্ষার্থ অল্পমাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এইসকল গোলমালের সংবাদ রমার কাছে পৌঁছিল। মুরলা বলিল, "মহারাণি, এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানে মরিব, কলঙ্কের পথে যাইব না। তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, স্মরণ করাইয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মন স্থির করিবার জন্য, নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে রাত্রিতে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল।

গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময়ে মুরলা উপস্থিত হইয়া রমার প্রেরিত সংবাদ তাহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, "বলেন ত এখন গিয়া ছেলে নিয়ে আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের

গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজ-পথে উঠিতে-না-উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল, ভয়ে মুখ কালি হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে রাজপথে ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবী মূর্ত্তি।

মুরলা তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

একজন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, "আমি ছোট রাণীর দাসী মুরলা।"

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এতরাত্রিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মু। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মু। যে আজ্ঞা।

তখন দুইজনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্র-মধ্য-বর্ত্তিনী করিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গেল।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে-রাত্রিতে নিদ্রা নাই। তিনি সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগর-রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে-কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া কথা বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে চাঁদ-শাহ ফকির আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন যে, জনকত সিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ

করিয়া নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন, কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃন্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, সিপাহীরা মৃন্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃন্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপ পীড়িত হইয়া কেবল হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগররক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগররক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

ভৈরবী। নগররক্ষকের সংবাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতা আপনি শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। সে তোরাব খাঁর নিকট গিয়াছিল। বোধ হয় তাহাকে নগর সমর্পণ করিবে। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! বোধ করিতেছি আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া এ দাসকে ভৈরবী বেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লান তেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন। এই বলিয়া চন্দ্রচূড় ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল; চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দ্বারদেশে সহসা ত্রিশূলধারিণী ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

ভৈরবীর কথা শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মা, আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ী গোলা-বারুদ দাও, আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—"কে এ?" জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনি গোলা-বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলাগুলি ইহার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে গোলাগুলি দিব কেন? কাহার চর, তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, তোমার ভূষণাগমন-সংবাদ ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন, দিতেছি",—বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা-যাহা চাহিল, সকলই দিল এবং পিয়ারীলাল নামে একজন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গ-দ্বার বন্ধ রাখিতে

আজ্ঞা দিল। যেন তাহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে-আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলাবারুদ লইয়া গড়ের বাহির হইয়া যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন।

দুইজন ভৈরবীর মধ্যে একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ী ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর-একজন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

সে বলিল, "আমি যে হই না। তুমি কে ?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল। দেবতা ভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই বা কি ?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও ?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব ?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড়ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চ চূড়ে উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে; কিন্তু তখনও তেমন ফরসা হয় নাই, বুঝা গেল না

যে, তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকা-শিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওপারে অত নৌকা কেন?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি?"

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন, "গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ-পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল, এখন রক্ষা করে কে?"

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না, ওপারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয়জন সিপাহী পার হইতে পারে? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবে, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তারপর সে সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবে, মুক্তদ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে, সে কোন আপত্তি করিবে না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিল, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার আর কিছু প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, "তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকাসকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ-ছয় শত মুসলমান-সিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি

অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়! হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম! এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন?" চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায়ে সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না। তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী সিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"তবে কি, এ আমাদের তোপ।"

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধূমরাশি আকাশ মার্গে উঠিয়া পবন পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, ঘাটের উপরে, গাছের তলায় একটা তোপ আছে, কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে?

চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিল—আবার মুসলমানসিপাহীপরিপূর্ণ আর-একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী! বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণা হইয়াছেন। জয় কালী! জয় পুর রাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে

দেখিলেন যে, যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল—তাহারা তীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল, শব্দে কান পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, “যদি আমাদের রক্ষক দেবতা হয়েন—তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত—এ লোহা বৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।”

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশ দিক্ কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে-চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল। আবার সসৈন্যে নৌকা ছিন্নভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন একদিকে—এক কামান—আর-এক দিকে শত-শত মুসলমানসেনায় তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কান পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্ম্মুহুঃ ইন্দ্রহস্ত-পরিত্যক্ত বজ্রের মত সেই কামান ডাকিতে লাগিল,—প্রশস্ত নদীবক্ষ এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তাল-তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধূঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন, নিমগ্ন নৌকাসকল স্রোতে উল্‌টি-পাল্‌টি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে-কয়খানা নৌকা ডোবে নাই, সে কয়খানার নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপরপারে পলায়ন করিয়াছে। মুসলমানসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাতযোড় করিয়া ঊর্দ্ধ্বমুখে, গদগদকণ্ঠে, সজল নয়নে বলিলেন, “জয় জগদীশ্বর! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ

করিয়াছ, নহিলে এই পুর রাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

তখন চন্দ্রচূড় প্রাসাদ শিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কামানের বন্দুকের হুড়্-মুড়্-দুড়্-মুড়্ শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল, "এ আবার কি! লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা?"

তখন গঙ্গারাম দুর্গের দ্বাররক্ষায় নিযুক্তদের চারিজনকে আদেশ করিল, "যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে, সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারিজন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা নৌকা বাহিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সিপাহীরা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে একজন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর-একজন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোয়ান, ধুতি মালকোঁচা-মারা, মাথায় মুখে গালপাট্টা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গ বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারিজন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "চল্ কোতোয়ালের কাছে যাইতে হইবে।"

"আচ্ছা, যাই। আগে মুসলমানেরা বিদায় হোক্। যতক্ষণ ওদের মধ্যে একজনকে ওপারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলেও উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ওকে চিনিতে পারিস্ কি না?

সিপাহীরা দেখিয়া বলিল, "ওকে ত চিনি, ও-আমাদের গোলন্দাজ পিয়ারীলাল যে—কেমন করে এখানে এলো ?"

"তবে আগে ওকে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

এদিকে কালি-বারুদ-মাখা পুরুষ ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যে, মুসলমান-সিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি সিপাহী-দিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" সিপাহীরা সে-ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে—যেখানে ভীত নাগরিকগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পূরিয়া উঠিল, সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী একেবারে সহস্রকণ্ঠে গর্জ্জন করিল, "জয় মহারাজের জয়!"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সমর দেখিয়া আমি জানিয়াছি, আপনি আসিয়াছেন। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দিন।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারাম তখন সিপাহীদিগকে দুর্গপ্রাকারস্থিত তোপসকলের নিকট এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া মৃন্ময়ের সম্বন্ধে সংবাদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন।

স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহ আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া, মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গেই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, ফৌজদার সুবাদারের অধীন এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। এক্ষণে মৃন্ময়ের সংবাদ না পাইলে কি কর্ত্তব্য কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃন্ময়ের সংবাদ আসিল। পীরবক্স খাঁ নামে ফৌজদারী-সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী-সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক-পথে মৃন্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃন্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃন্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া, নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি, এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেইজন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যতপ্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি। যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ-দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

অতএব শ্রী রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

———

তৃতীয় খণ্ড

রাত্রি—ডাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদসাহী-সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতি-প্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের কাছে প্রকাশ করিল। বাকী যেটুকু, মুরলী ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকী—এমন সময়ে এ-কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথাগুলা রমা অন্তঃপুরে বসিয়া সীতারামের কাছে, চক্ষুর জলে ভাসিতে-ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার এক বর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন, রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না।

সীতারাম শেষে দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে সহস্র-সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই।

রমা। তুমি কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকেও যাইতে হইবে না, কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে লইয়া গিয়া কেহ আমার নিকটে দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড়-চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও।"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়! বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাকালে মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, "কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন।

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। চাঁদশাহ ফকির যাহা জানিতেন তাহাও বলিলেন।

গঙ্গারাম সকলই অস্বীকার করিল।

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন ধীরে ধীরে রমা আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল এবং পুত্রের বিপদ্ শঙ্কায় যাহা যাহা করিয়াছিল সবিশেষ বলিল।

গঙ্গারাম রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাজ! এই মহারাণী অকারণে আমাকে দোষী করিতেছেন, তাঁহার—মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থর-থর

করিয়া কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিল—অপূর্ব্বমূর্ত্তি, জটাজূটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ত্রিশূল হস্তে গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। গঙ্গারাম এক-দিন রাত্রিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। আবার এই বিপৎকালে, যখন নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে সে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া, ভয়ে কাতর হইয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" শব্দ করিয়া উঠিল। এদিকে রাজা, ওদিকে চন্দ্রচূড়, সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন।

জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

ত্রিশূল গঙ্গারামের গাত্রস্পর্শ করিলে গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম এখন সভয়ে বিনীতভাবে সত্য বৃত্তান্ত সভা সমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। কথাশেষে জয়ন্তী ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। সে কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে, রাজা গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেননা, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত।

অভিষেকের দিন আসিল। বড় ধূমধাম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ।

এই অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার—দান। সীতারাম সারাদিন নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে-যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, সেই ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্ত্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।” জয়ন্তী বলিল, “মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।”

রাজা বলিলেন, “মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।”

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তাহার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। আপনি সেই মধুমতী তীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন। সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন আজ

আপনার নিকট বেচিব। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, আপনি সব দিতে পারেন, আমার জীবন আমায় দিয়া সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুরদ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন, আর অন্তঃপুরে প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হৌক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচরবর্গকেও সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি ?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগৃহ মধ্যে গঙ্গারাম শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথকালেও তাহার নিদ্রা নাই।

দুই প্রহর রাত্রিতে ঝঞ্জনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে ? আরও কিছু নূতন বিপদ আছে নাকি ?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি ?"

জয়ন্তী বলিল, "কি করিয়াছ তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম, কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কিনা, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল যে, রাজপুরুষেরা বেড়ী খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিল, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম উর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞামত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

নন্দা বলিল, "কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও। আর আমি যেজন্য যাইতে পারিলাম না, তাহাও বলিও।

নন্দা চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র-রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্তকুন্তলা কমনীয়া মূর্ত্তি।

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে কহিলেন, "কই? শ্রী কই? কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী! তখন সীতারাম ঊর্দ্ধ্বমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্ত-দৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজা বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিত ধৈর্য্যসম্পন্না মহামহিমময়ী, এ যে দেবী-প্রতিমা। বুঝি এ-শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক-কতক বলিল, সকল বলিল না।

তারপর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। যেদিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সেদিন গিয়াছে।

সীতা। সে কি? কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতা। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি, কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। স্বামীর কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে আমি যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কেবল আমার এইটুকু বলিয়া রাখা যে, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে এই রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া আমাকে একটু পৃথক্ কুটীর তৈয়ারী করিয়া দিবে। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমি সুখী হইব না।

সীতা। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে; কেন না, তুমি বলবান্। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে, তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে-সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রী কিছুতেই রাজপুরী মধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল ; রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন-আহার এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে ; শ্রীর বাঘছালের নিকট ঘেঁষিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন-দিন বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল।

শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

———

নবম পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ দুইজন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে দুইজন নিভৃতে কথোপকথন করিতেছিল।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি ?

শ্যামচাঁদ। শুনেছি, সেটা না কি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী-বেশ ধ'রে বেড়ায়। আবার কেউ বলে, তার একটা জোড়া আছে। সেটা উড়ে-উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় কেউ দেখিতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ! রাজা পড়িল ডাকিনীর হাতে। এ-রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে ?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর রাজকর্ম্ম দেখেন না। এদিকে নাকি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে! এখনই ত কয় ঘর আমাদের পাড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা, দাদা, তোমার কাছে বল্‌ছি, প্রকাশ করিও না, আমিও শীগ্‌গির সর্‌বো।

রাম। বটে! তা আমিই পড়ে জবাই হই কেন ? তবে কি জান, এই-সব বাড়ী ঘর-দ্বার খরচপত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে-টেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যাম। তা কি করবে, প্রাণটা আগে, না, বাড়ী-ঘর আগে ? ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর-দ্বার ত পালাবে না।

———

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। তাছাড়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃন্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুর্শিদাবাদের সংবাদ পাইতেছ কি? তোরাব খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভূঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সীতা। সে ভাবনা করিও না। মুর্শিদকুলি যতক্ষণ মাল-খাজনা ঠিক কিস্তী-কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সীতা। হ্যাঁ, পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচপত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছ?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয়, তাই।"

শ্রী। তবে আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ আবার লুকাইতে হইবে, নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্মরাজ্য ছারেখারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে, রমা পীড়িতা। কেহই তাহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। কবিরাজেরা যাহা ঔষধ দেয়, রমা তাহা না খাইয়া গোপনে ফেলিয়া দেয়। কাজেই তাহার রোগ সারিল না। ক্রমশঃ শরীর-ধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই-এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে ; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, "হায়, রাজবাড়ীর কবিরাজগুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে ?"

নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকিয়া পাঠাইল। সকলে আসিলে নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম-মধ্যম রকম ভর্ৎসনা করিল। বলিল, "রোগ যদি ভাল করিতে পার না, তবে মাসিক লও কেন ?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা ! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধেও কাজ নাই। তোমরা আপনার আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজমণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ, তিনি বলিলেন, "মা ! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, বেটি ঔষধ খায় না ; "আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে ?"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখেও স্থান নাই। মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে ?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে, ত আর তিনটে দিন খেতে কি ?

রমা। আমি ঔষধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল—বলিল, "সে কি, মোটে না ?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন ? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল।

নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম রমাকে দেখিতে আসিলেন। রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই। সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল।

আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিল, "ওকে একবার কোলে নাও।"

সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম—কথা রাখিবে কি ?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকৃত হইলেন। রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মাথায় দিল।

তারপর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে পড়িতে লাগিল, চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যেদিন রমা মরিল, সেদিন সীতারাম চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। ভাবিয়া দেখিলেন, রমার দোষ বড় বেশী নয়—দোষ তাঁর নিজের। মনে-মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাপ হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, কেন না, শ্রীর সঙ্গে এই আত্ম-গ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ ; রমার প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরাচরণের কারণই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুন আরও বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। রমার প্রসঙ্গ উঠিলে নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।" একে ত আত্মগ্লানিতে

সীতারামের মেজাজ খারাপ হইয়াছিল—কোনমতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল।

রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড় ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর-একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য-লাভ করিতে পারিতেন।"

জ্বলন্ত আগুন এ ফুৎকারে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে, আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ?" চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, "এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে, কাহারও চরিত্র শোধন হয় না।" অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়।"

রাজা। তত্ত্বাবধানের অভাব—আপনারা করেন কি?

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—আমারও ইচ্ছা, তোমায় কিছু শিখাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বিবেচনা করা যাইবে।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সাতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন, সে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হউক না কেন, আর যত বড় রাজা হউক না কেন, টাকা নইলে কোন রাজ্যই চলে না।

সীতারামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত; কেননা, সীতারামের আয় অনেকগুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভূঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ-পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—তবে টাকা অকুলান কেন?

অকুলানের আসল কারণ, চুরি। রাজা এখন আর কিছু দেখেন না, চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন, কাজেই রাজপুরুষেরা রাজ-ভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড়ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহই মানে না। তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজ-পত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।"

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন। বলিলেন, "সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।"

এই হুকুম জারি করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুমমত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল, অনেক রাজকর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না।

চন্দ্রচূড় সন্ধানে-সন্ধানে ফিরিয়া আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন —বলিলেন, সিপাহীসব দলে দলে চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

রাজা। কেন ?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন, আদায় তহশীল হইতেছে না ?

চন্দ্র। এক পয়সাও না, যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে, "আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি ?"

রাজা। তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেকে দিতেছে না।

রাজা। যে টাকা না দিবে তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে-মনে শপথ করিলেন, আর কখনও রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল। বাকিদার, তহশীলদার উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।

আগুন জ্বলিয়াই ছিল, এখন ঘর পুড়িল ; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এত অবনতি হইত কিনা জানি না ; কেন না, সীতারাম ত মনে-মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্য-শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায়

বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম ; কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তখন সে যদি নন্দার মত রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়।

এদিকে অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড়ঠাকুর রাজাকে আর একদিন পাকড়াও করিয়া বলিলেন, "মহারাজ ! তীর্থ-পর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিতেছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড়ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সেদিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেইদিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা সাত-পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমার এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যে নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ ?"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। তারপর শ্রী বলিল, "পলায়ন বিধি কি না ?"

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষমানুষের মেয়ে ভুলান কথা।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই, দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন ?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল সবই আছে দেখিতেছি, ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ ? তারপর তুমি যাইবে কি প্রকারে ?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "এ কি আমার সৌভাগ্য! এতকালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে! আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি ?"

শ্রী। রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন!

জ। হইলে আমার কি করিবেন ? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারে ?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে ?"

জ। তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে, তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ-তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে

রাজপুরী মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাম। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ-যজ্ঞে কিছুতেই গেল না—এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে? সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি?

শ্যাম। আজ তিন দিন হইল রাজা ঢেঁটরা দিয়াছেন যে, কাল এক মেয়ে-চোরকে বেত মারা হবে, যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কারঠাকুরই-বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী-বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা নাকি অনেক বলেছেন। কারুর কথা তিনি কানে নেননি! রাজা বলেন, "ভাল, দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?"

রাম। তা এক রকম বলেছে, মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত! তা, ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখতে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈকি! সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখতে যাবে?

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, প্রভাত হইতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না।

এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুক্‌রাইল, স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন।

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধ্বমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল, সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল।

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন, দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়াইয়া যায়? জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে। আপনার কাজে যাও।

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইল—বেত উঁচু করিয়া জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া রাজার পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি!" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন। চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।" চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।"

তখন রাজার হুকুমে অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ একজন

কসাইকে লইয়া আসিল। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া, মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে করিয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী মনে-মনে ডাকিতে লাগিল, "জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর!"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।"

রাজা কর্ণপাত করিলেন না।

নিরুপায় জয়ন্তী আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"

বুঝি জগন্নাথ সে-কথা শুনিলেন, সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে-করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"রাণীজী কি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কার শিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল! কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, "মা! দয়া করিয়া অভয় দাও! মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না! নন্দা অনেক অনুনয় করিয়া স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ

করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।" নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এখন জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। তখন নগরমধ্যে বোঁচকা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকে নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

উদ্ভ্রান্তচিত্ত সীতারাম নানারকমে প্রজাদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন সুরু করিলেন।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া চন্দ্রচূড়ঠাকুর এবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহ-জীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন ?"

চন্দ্র। কাশী—আপনি কোথায় যাইতেছেন ?

ফকির। মক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়।

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে-দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে-মনে ডাকিতে লাগিল,—"জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তারপর জয়ন্তী ভাবিল যে, যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত, বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠি।

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী বলিল, "আছে! তবে মহম্মদপুরে চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে-করিতে যাইব।"

দুইজনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবু কি সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকি, মৃন্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃন্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য একদিন প্রাতে মৃন্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃন্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃন্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃন্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান-সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ-সংবাদ মৃন্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে, পূর্ব্বাহ্ন সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান-সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান-সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌছিল যে, "মৃন্ময় মরিয়াছে। মুসলমান-সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে-মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগ-বিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ, জীবনের শেষ।" তখন রাজা গাত্রোত্থান করিলেন!

রাজা গিয়া দেখিলেন, সেনা এখনও গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র—তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বারসম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতিপূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল। যে-কয়জন বাকি ছিল, তাহারা মৃন্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুণ খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া-গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে-মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।"

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই। সকলেই আপন-আপন ধন-প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহই নাই। দুই-এক জন অতি পুরাতন দাস-দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন যে-যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন-আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে-মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম! গুড়ুম! করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল। তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাকোলাহল অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারিপাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে?"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ?

নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীর-ধারণে মৃত্যু আছেই, সেজন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে-করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই। এক শত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, "মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহুভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইতে! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে!"

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ! তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ

উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে, তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালকবালিকাগুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে-মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যু-কামনায় একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে সেইরূপ ভৈরবী-বেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন, বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদগদ কণ্ঠ, সজললোচন —কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এতকাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,—

এই বলিয়া শ্রী, মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আজ সন্ন্যাসিনী নই, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সীতা। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সীতা। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সীতা। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও। ঐ শোন! শত্রুর কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই

দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর-একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। তাহা আর হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই যে, আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ সেনা-সকলে, এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগকে হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ-যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষুতে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি? জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্য-মদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায় অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিতে মনে পড়িল। তখন সীতারাম মনে-মনে ডাকিতে লাগিলেন, "নাথ! দীননাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান-সেনার কোলাহল; প্রাচীর-ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ—মাঠে-মাঠে, জঙ্গলে-জঙ্গলে, নদীর বাঁকে-বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—দুর্গমধ্যে জনশূন্য,—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী

ও শ্রীর সপ্তস্বর-সংবাদিনী আকুলিত-কণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল।

শুনিতে-শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন,—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।

এমন সময় দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। শব্দ শুনা গেল—"জয়, মহারাজকি জয়! জয় সীতারামকি জয়!"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। সিপাহী সকলেই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে; কেবল জন-পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা-বাছা লোক—বাছা-বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে মুসলমান-সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে, গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না! রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না; কিন্তু তাও ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত' বলে না, "আইস! আমার জন্য মর!" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহাদের মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সে কি ভাল হইবে? আইস, মরিতে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক! মরিবার আবার হুকুম-হাকাম কি?

মহারাজের নিমক খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা, হুকুম না পাইলে, কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল, হুকুম হোক্ না হোক্, আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকারে? এখন দুর্গরক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমনি জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও গড়ে আছেন। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন-আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালন পূর্ব্বক অস্ত্রে-অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা শব্দ উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, 'জয় মহারাজকি জয়। জয় রাজা সীতারামকি জয়।"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কানে প্রবেশ করিয়াছিল।

———

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যোদ্ধৃগণ জয়ধ্বনি করিতে-করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয়জন মুসলমানকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা ততক্ষণে নিবিষ্টমনা হইয়া সেই সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি, কিন্তু দুই-চারিজন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল; বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণ জী!" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া জয়ধ্বনি করিতে-করিতে অগ্রে-অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "সে কি? এখনই পিষিয়া মরিবে যে।"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজাও এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না।

তারপর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি

খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গম্বুজের ভিতরে তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবন-সেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট আপনি উদ্‌ঘাটিত হইল, উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান-সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনাতরঙ্গ—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্ত্তি, তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনই সর্ব্বজন-মনোমুগ্ধকারি সেই জয়গীতি!—মুসলমান-সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূলের ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবন-সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমানসেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার!

তাঁর প্রফুল্ল কান্তি এবং সামান্য অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান-সেনা 'মার্-মার্' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুইজনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া



সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন।

হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর একজন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান-সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মুসলমান-সেনাপতি, সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখদিকে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামানসকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে রাজা-রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সেদিকে যাইতে পারিলেন না। কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেইদিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেইদিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচজনে লুঠিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী, জয়ন্তী দুইজনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিয়া, চারিদিক্ চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তারপর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া সেইরূপ হাসি হাসিল—দুইজনে যেন বলাবলি করিল—"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া-শুনিয়া গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ! রক্ষা কর!"

"শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল

করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতের তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমানসেনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী, পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্যধ্বংস হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হ্যাঁ। তুমি মহারাজকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে। তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চোখের জলই বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধ-বাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ, আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত।

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, কিন্তু মহারাজ বাঁচিয়াছেন। সে তোমার উপযুক্ত কাজ হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ—মানুষই চিরকাল থাকিবে। তুমিও লোকালয়ে লৌকিক-লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাস-বিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি- রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। এই বলিয়া দুইজনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে-করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকাচুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল, তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে! শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎ‍্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই, আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল।

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

———

পরিশিষ্ট

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলভাঙায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে ত জানাই ছিল। গড়-টড় সব মুসলমানে দখল করে লুঠ-পাঠ করে নিয়েছে।

রাম। রাজা-রাণীর কি হ'লো, কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদে চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি, তাই বটে, তবে কিনা, শুন্‌তে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন, তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

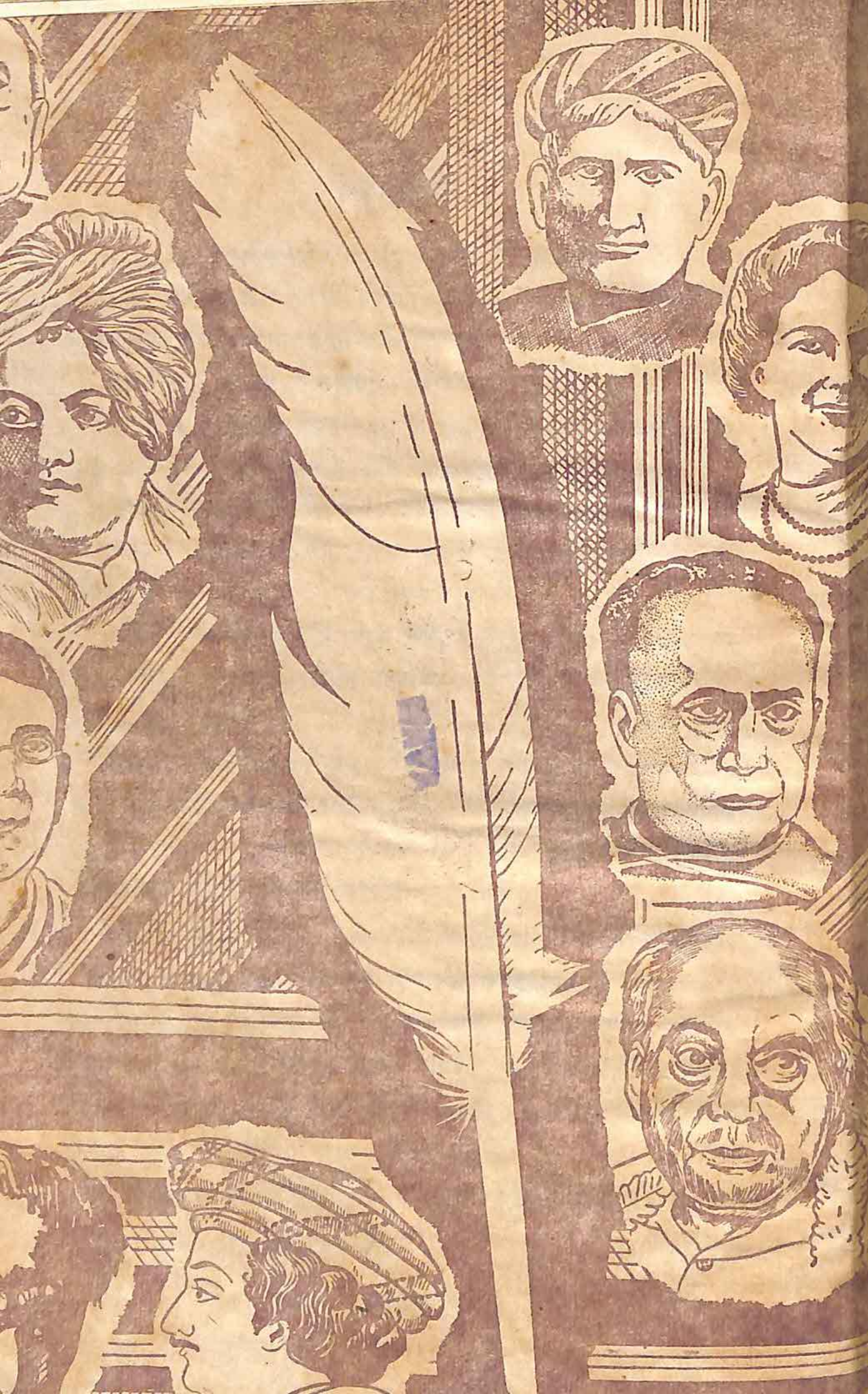
শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ-কেউ বলে, রাজা-রাণী নাকি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। তারপর মুসলমানেরা জাল রাজা-রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন। ও-সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

শ্যাম। তা, এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা নাহয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার-আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের! এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।

সমাপ্ত





বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাদুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন্
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিটলার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ কলিঃ-৯